

## সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

### ১. পটভূমিঃ

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত র‌্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ-পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব থেকে জনগণ আশা করেছিলেন, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করলেন, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ বহুবাচনিক সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালীর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পাল্টাবেন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ-কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা-ষড়যন্ত্রের গ্রন্থিগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যেন শাসন ক্ষমতা কোনক্রমে বাঙ্গালীর হস্তগত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন।

### ২. ভাষা আন্দোলনঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জববারসহ আরো অনেকে শহীদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

### ৩. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনঃ

১৯৫৪ সালে ১০ই মার্চ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হলে বাঙালিদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দেয়। জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালি, অতএব এই নির্বাচনের ফলাফল চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একই সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন তুলে নেয়া হ'লে ছাত্র সমাজ অধিকারের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

### ৪. ১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনঃ

আন্দোলন নতুন করে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হন যার মধ্যে ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও বাবুল অন্যতম। ছাত্র সমাজের ২২ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ১৭ই সেপ্টেম্বর '৬৩ 'শিক্ষা দিবস' পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বীর আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলসমূহ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছাত্রদের এই আন্দোলনের সবরকম সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে।

### ৫. ছাত্র সমাজের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিঃ

পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটা অসম্ভব বিবেচনা করে তৎকালীন ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ১৯৬২ সালে গোপনে ছাত্রদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেন জনাব সিরাজুল আলম খান, জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ। এই সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্ল-বী পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল।

### ৬. '৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলনঃ

১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দুরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।' পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

### ৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংগঠনের কোন এক সদস্যের অসতর্কতার ফলে পাকিস্তান সরকারের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে

পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক বেসামরিক ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন '৬৮ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। ১৯শে জুন ১৯৬৮, ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচার কার্য চলার সময় থেকে শ্লোগান ওঠে- 'জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব।' এই গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এই সময় সমস্ত দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে।

## ৮. '৬৯ এর গণ-আন্দোলনঃ

পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো।' এই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মুক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। বাঙালি একক জাতিসত্তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০শে জানুয়ারী '৬৯ ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪শে জানুয়ারী '৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগ স্থলের আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে 'আসাদ গেট' এবং বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয়। জানুয়ারী '৬৯ এ গ্রহিত ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি '৬৯ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত অবস্থায় বন্দী আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি '৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই মৃত্যু সংবাদ গণ-আন্দোলনে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রচন্ড-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি '৬৯ এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি '৬৯, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্ত সকলেই ঢাকা সেনানিবাস থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি '৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ডঃ শামসুজ্জোহাকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে। '৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দর, রাশেদ খান মেনন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, দীপা দত্ত, হায়দর আকবর খান রণোসহ অনেকে। রাজনৈতিক দলীয় প্রধান যাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান, কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর অন্যতম।

### ৯. '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনঃ

২৫শে মার্চ ৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ৭ই ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে। 'বাঙালির শাসন মেনে নেওয়া যায় না' এই নীতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ নির্বাচিত এই জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় অধিকারের সংঘাত। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ৭০ এ বঙ্গবন্ধু এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার ম্যাপ অংকিত একটি পতাকা প্রদান করেন। এই পতাকাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদের এই সংগঠন প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ জন সমাজকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

### ১০. '৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনঃ

নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহ্বান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়। ৩রা মার্চ '৭১ এ রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ইসতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইসতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই ভাষণে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা। ..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচিত। ৭ই মার্চের

এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২৩শে মার্চ ৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে এই পতাকা লাগান হয়। ২৩শে মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়। অন্যদিকে ক্ষমতার হস্তান্তরের নামে এই আলোচনা চলা অবস্থায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সৃষ্ট সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে নতুন করে সংকটের সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপনের ফলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ এক সময় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক শাসকগণ স্বার্থাশেষী মহলের সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে সামরিক বাহিনী মাত্র ২২ দিনে দুই ডিভিশন অবাঙালি সৈন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরে সক্ষম হয়। বাস্তবতায় এটিই ছিল তাদের আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য। ২৪শে মার্চ ৭১ সামরিক শাসকগণ হেলিকপ্টার যোগে সমস্ত সেনানিবাসে এই আক্রমণের পরিকল্পনা হস্তান্তর করে। বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যায়জ্ঞের নির্দেশ নামা "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে পরিচিতি। ২৫শে মার্চ ৭১ রাত্রি ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সেনানিবাস অথবা আক্রমণ প্রস্তুতিস্থানগুলি ত্যাগ করে। একই সাথে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহর ও সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

### ১১. অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যাঃ

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি "অপারেশন সার্চলাইট" নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ই বি আর সিসহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের কথা যেন বহির্বিষয় না জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়। আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণও এই গণহত্যা পরিকল্পনারই অংশ ছিল।



২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারীদেরও হত্যা করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে।

## ১২. স্বাধীনতার ঘোষণাঃ



তিনি পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের জন্য বাংলার জনগণকে আহ্বান জানান। চট্টগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন

যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার জোটবদ্ধ না হয়ে বিশেষর অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশেষর সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের দলিলপত্র: মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খন্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২)

### ১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনঃ

১০ই এপ্রিল ৭১ নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভেবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদটির এই সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পীকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাঁরা হলেনঃ

- ১। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দী)
- ২। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)
- ৩। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
- ৪। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
- ৫। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ (আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
- ৬। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে) এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশ বিদেশের শতাধিক সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসীর উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ জনাব আবদুল মান্নান। নবগঠিত সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয় "মুজিব নগর"।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি "সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেনঃ

- ক) জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ন্যাপ ভাসানী
- খ) শ্রী মনি সিং সভাপতি বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি
- গ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ সভাপতি ন্যাপ মোজাফ্ফর
- ঘ) শ্রী মনোরঞ্জন ধর সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস
- ঙ) জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে

চ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদাধিকারবলে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় উপস্থাপনসহ এবং একটি সময় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ দেশত্যাগী এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোয় কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গঃ

১। যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেনঃ

- ক) রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, এম এন এ
- খ) প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এম এন এ
- গ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনাব আবদুল মান্নান, এম এন এ
- ঘ) জয় বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান, এম এন এ
- ঙ) যুব শিবির নিয়ন্ত্রণ পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ

২। বেসামরিক প্রশাসনঃ

- ক) ক্যাবিনেট সচিব জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম)
- খ) মুখ্য সচিব জনাব রুহুল কুদ্দুস
- গ) সংস্থাপন সচিব জনাব নূরুল কাদের খান
- ঘ) অর্থ সচিব জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান
- ঙ) পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাহাবুবুল আলম চাষী এবং জনাব আবুল ফতেহ
- চ) প্রতিরক্ষা সচিব জনাব এম এ সামাদ
- ছ) স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব এ খালেক
- জ) স্বাস্থ্য সচিব জনাব এস টি হোসেন
- ঝ) তথ্য সচিব জনাব আনোয়ারুল হক খান
- ঞ) কৃষি সচিব জনাব নূরউদ্দিন আহমেদ
- ট) আইন সচিব জনাব এ হান্নান চৌধুরী

- ৩। কুটনৈতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেনঃ
- ক) মিশন প্রধান যুক্তরাজ্য, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (বহিঃবিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত)
- খ) মিশন প্রধান কলিকাতা, জনাব হোসেন আলী
- গ) মিশন প্রধান নতুন দিল্লী, জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
- ঘ) মিশন প্রধান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জনাব এম আর সিদ্দিকী
- ঙ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইরাক, জনাব আবু ফতেহ
- চ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত সুইজারল্যান্ড, জনাব অলিউর রহমান
- ছ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিলিপাইন, জনাব কে কে পন্নী
- জ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেপাল, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
- ঝ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হংকং, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
- ঞ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত জাপান, জনাব এ রহিম
- ট) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত লাগোস, জনাব এম এ জায়গীরদার

- ৪। স্বাধীন বাংলাদেশের গণমুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ
- (ক) ডঃ মোজাম্মের আহমেদ চৌধুরী
- (খ) ডঃ মোশাররফ হোসেন
- (গ) ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ
- (ঘ) ডঃ এম আনিসুজ্জামান
- (ঙ) ডঃ স্বদেশ বোস।

৫। মুক্ত এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখাশুনা ও যুব শিবির পরিচালনার জন্য সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকায় চেয়ারম্যান ও প্রশাসক নিয়োগ করেন।

## ১৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ

মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে

বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হয়। প্রতিদিনের সংবাদসহ যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে চরমপত্র ও জল্পাদের দরবার অন্যতম। যে সমস্ত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেনঃ

সর্বজনাব এম এ মান্নান এম এন এ, জিল্লুর রহমান এম এন এ, শওকত ওসমান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ ময়হারুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, কল্যাণ মিত্র, ফয়েজ আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, তোয়াব খান, আসাদ চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, মহাদেব সাহা, আলী যাকের, সৈয়দ হাসান ইমাম, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল কাসেম সন্দীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, ডঃ অরুণ রতন চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, রাজু আহামেদ, মামুনুর রশীদ, বেগম মুশতারী শফি, শাহীন মাহমুদ, কল্যাণী ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, মিতালী মুখার্জী, বুলবুল মহলানবীশ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সৈয়দ আবদুস সাকেরসহ অনেকে।

## ১৫. বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীঃ

যে জনযুদ্ধ এনেছে পতাকা, সেই জনযুদ্ধের দাবিদার এদেশের সাত কোটি বাঙালি। একটি সশস্ত্র যুদ্ধ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এই সশস্ত্র যুদ্ধ একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেনঃ ক) চট্টগ্রাম অঞ্চল - মেজর জিয়াউর রহমান

খ) কুমিল্লা অঞ্চল - মেজর খালেদ মোশাররফ

গ) সিলেট অঞ্চল - মেজর কে এম সফিউল্লাহ

ঘ) দক্ষিণ পশ্চিম - অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭ই জুলাই ৭১ যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সরকার নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনায় 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করেন। এই জেড ফোর্সের অধিনায়ক হলেন লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান। একই ভাবে সেপ্টেম্বর মাসে 'এস ফোর্স' এবং ১৪ই অক্টোবর 'কে ফোর্স' গঠন করা হয়। কে ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল কে. এম. সফিউল্লাহ।

১০ই জুলাই ৭১ থেকে ১৭ই জুলাই ৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের

অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। এই কমান্ডারগণ ছিলেনঃ সেক্টর অধিনায়ক যুদ্ধ এলাকা ও তথ্য

সেক্টর-এক মেজর রফিকুল ইসলাম চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অংশ বিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত)। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২১০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল

২০,০০০।

সেক্টর-দুই মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা জেলার অংশ, ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার অংশ এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৪,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৩০,০০০।

সেক্টর-তিন মেজর কে এম শফিউল্লাহ কুমিল্লা জেলার অংশ, ময়মনসিংহ জেলার অংশ, ঢাকা ও সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৬৬৯৩ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০।

সেক্টর-চার মেজর সি আর দত্ত সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৯৭৫ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-পাঁচ মেজর মীর শওকত আলী সিলেট জেলার অংশ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ১৯৩৬ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-ছয় উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১১,০০০।

সেক্টর-সাত মেজর নাজমুল হক রংপুর জেলার অংশ, রাজশাহী জেলার অংশ, পাবনা জেলার অংশ ও দিনাজপুর জেলার অংশ, বগুড়া জেলা। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল নয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১২,৫০০। সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হওয়ার পর লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-আট মেজর আবু ওসমান চৌধুরী যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলা, কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০। ১৮ই আগস্ট লেঃ কর্নেল এম আবুল মঞ্জুর সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-নয় মেজর আবদুল জলিল বরিশাল জেলার অংশ, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা, ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল তিনটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০।

সেক্টর-দশ প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে (নৌ সেক্টর) সমগ্র বাংলাদেশ। এই সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের দিয়ে। বিভিন্ন নদী বন্দর ও শত্রু পক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এঁদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্তুতি বিশ্লেষণ করে অভিযানে সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার ওপর নির্ভর করত অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালানো হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর- ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় চলে আসত। নৌ-কমান্ডোর সংখ্যা ছিল ৫১৫ জন।

সেক্টর এগার মেজর আবু তাহের। ময়মনসিংহ জেলার অংশ, সিলেট জেলার অংশ ও রংপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০। মেজর আবু তাহের ১৪ নভেম্বর আহত হওয়ার পর এই সেক্টরের দায়িত্ব কাউকেও দেয়া হয়নি।

১৬. মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তরঃ

ক) প্রধান সেনাপতি মুক্তিবাহিনী কর্নেল এম এ জি ওসমানী

খ) সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল আবদুর রব

গ) বিমানবাহিনী প্রধান ও উপ-সেনা প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ঘ) ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিস মেজর শামছুল আলম

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মোট ১৩১ জন অফিসার মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৫৮ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের মূর্তি অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কোর্স-কে প্রথম বাংলাদেশ সার্ট সার্ভিস কোর্স বলা হয়। ৬৭ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় সার্ট সার্ভিস কোর্সে ভর্তি করা হয় এবং তারা ১৯৭২ সনে কমিশন প্রাপ্ত হন। মুক্তিযুদ্ধে ১৩ জন সামরিক অফিসার যুদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। ৪৩ জন সামরিক অফিসারকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে হত্যা করে।

## ১৭. মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীঃ

ক। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগ করে আসা বাঙ্গালী অফিসার, ক্যাডেট ও বিমানসেনারা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মোট প্রায় ৩৫ জন অফিসার ও ক্যাডেট এবং প্রায় ৫০০ বিমানসেনা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এইসব বিমান বাহিনীর সদস্যরা যদিও স্থলযুদ্ধে খুবই বিরোচিত ভূমিকা রাখছিলেন তবুও তাদের মধ্যে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের চেতনা খুব প্রবল ভাবে কাজ করছিল। এই চেতনা নিয়েই কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা পাইলট ভারতীয় বিমান বাহিনী, ভারতীয় সরকার এবং বাংলাদেশ ফোর্সেস (বিডি এফ) এর সাথে বিভিন্ন রকমের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খ। কিলো ফ্লাইট : ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি ভারত সরকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের জন্য আমেরিকায় তৈরী ১টি পুরানো ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরী ১টি অটার বিমান এবং ফ্রান্সের তৈরী ১টি এ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার দেয়। এর সাথে ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে একটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত রানওয়ে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান গুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সশস্ত্র বিমান বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্ত নাম হয় 'কিলো ফ্লাইট'। 'কিলো ফ্লাইটের' অস্তিত্ব বিডি এফ এবং গোটা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কেউ জানতেন না। কিলো ফ্লাইটে বিমান বাহিনীর পাইলটদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পি আই এ এবং প্লান্ট প্রটেকশনের পাইলট এসে যোগ দেন। বিভিন্ন সেক্টর হতে যুদ্ধরত মোট ৫৮ জন বিমানসেনাকে এই ফ্লাইটে নিয়ে আসা হয়। এই ফ্লাইটের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় স্কোঃ লীঃ সুলতান মাহমুদকে। এই সব অতুৎসাহী বিমান বাহিনী সদস্যদের সমন্বয়ে ১৯৭১ এর ২৮ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উদ্বোধন হয়। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ। এই ফ্লাইট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট এলাকায় মোট ৫০টি অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। এদের মধ্যে মোগলহাটে (১৫ অক্টোবর ৭১), লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁয়ে (১৬ অক্টোবর ৭১), চৌগাছায় (২১ নভেম্বর ৭১), গোদনাইল ও পতেঙ্গায় (৩ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৪ ডিসেম্বর ৭১), জামালপুরে (৫ ডিসেম্বর ৭১), মেঘনা নদীতে (৬ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৭ ডিসেম্বর ৭১) এবং নরসিংদীতে (১১ ডিসেম্বর ৭১) বিমান হামলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ১৮. মুক্তিযুদ্ধে নৌ-বাহিনীঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্সের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ নৌ বাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙ্গালী অফিসার ও নাবিকগণ পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে দেশে এসে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠন করেন। ভারত থেকে প্রাপ্ত 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামের ছোট দুটি গানবোট এবং ৪৯ জন

নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সমস্ত নাবিকগণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হন। পাশাপাশি 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে নির্ভীক ডুবুরীদল সমুদ্র ও নদী বন্দর সমূহে বিধংসী আক্রমণ পরিচালনা করেন। এতে হানাদার বাহিনীর ২৬ টি জাহাজ ধ্বংস হয় ও সমুদ্র পথ কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। নৌ বাহিনীর অপারেশনের মধ্যে হিরণ পয়েন্টের মাইন আক্রমণ (১০ নভেম্বর ৭১), মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌযান ধ্বংস (১২ নভেম্বর ৭১), চালনা বন্দরে নৌ হামলা (২২ নভেম্বর ৭১), চট্টগ্রাম নৌ অভিযান (০৫ ডিসেম্বর ৭১), পাকিস্তান নৌ ঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর অভিযান (১০ ডিসেম্বর ৭১) উল্লেখযোগ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে শত্রুপক্ষ নৌ পথে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ শহীদ রুহল আমিন, ইআরএ-১, কে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদান করা হয়। এছাড়া ০৫ জনকে বীর উত্তম, ০৮ জনকে বীর বিক্রম এবং ০৭ জনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর ভূমিকাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

১৯. ব্রিগেড সংগঠন ও অপারেশনঃ

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকটা ছিল গেরিলাভিত্তিক কিন্তু এভাবে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের পদানত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও মুক্তাঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্মুখ সমরের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। এরা হচ্ছেঃ

ক) জেড ফোর্স- লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামানুসারে জুলাই ৭১ সনের ৭ই জুলাই গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় জেড ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ৩ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ৮ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। জুলাই ৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ৭১ পর্যন্ত জেড ফোর্স ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারী এলাকায় যুদ্ধরত থাকে। অক্টোবর থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তারা সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। জেড ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল কামালপুর যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন, দেওয়ানগঞ্জ থানা আক্রমণ, নকসী বিওপি আক্রমণ, চিলমারীর যুদ্ধ, হাজীপাড়ার যুদ্ধ, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজি, সালুটিকর বিমানবন্দর, খলই, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলি ময়দান, সিলেট এমসি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইঘাট, ফুলতলা চা বাগান, বড়লেখা, লাটু, সাগরনাল চা বাগান, ছাতক ও রাখানগর।

খ) কে ফোর্স- লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফের নামানুসারে সেপ্টেম্বর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় কে ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ৯ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ১০ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ১ ফিল্ড ব্যাটারি (মুজিব ব্যাটারী) আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। কে ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল দেউশ মন্দভাগ অভিযান, শালদা নদী অভিযান, পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, নিলক্ষ্মীর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, চাপিলতার যুদ্ধ, কুমিল্লা শহরের যুদ্ধ, নোয়াখালীর যুদ্ধ, কশবার যুদ্ধ, বারচরগ্রাম যুদ্ধ, মিয়াবাজার যুদ্ধ, গাজীপুর যুদ্ধ, সলিয়াদীঘি যুদ্ধ, ফেনী যুদ্ধ, চট্টগ্রাম বিজয় ও ময়নামতি বিজয়।

গ) এস ফোর্স- লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহর নামানুসারে অক্টোবর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় এস ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, ১১ ইন্স্ট বেঞ্জল রেজিমেন্ট, এস ফোর্সের উল্লেখযোগ্য

যুদ্ধ সমূহ ছিল ধর্মগড় আক্রমণ, মনোহরদী অবরোধ, কলাছড়া অপারেশন, বামুটিয়া অপারেশন, আশুগঞ্জ অপারেশন, মুকুন্দপুর যুদ্ধ, আখাউড়া যুদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যুদ্ধ, ভৈরব ও আশুগঞ্জ যুদ্ধ, কিশোরগঞ্জ যুদ্ধ, হরশপুর যুদ্ধ, নরসিংদী যুদ্ধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ।

২০. বি এল এফ (মুজিব বাহিনী):ঃ

বিশাল এই জনযুদ্ধে ছাত্র ও যুবক শ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ছাত্র আন্দোলনের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। ৬০ দশকের মাঝামাঝি এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্রদের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি সমন্বিত করে। নেতৃস্থানীয় প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) ছাত্রকে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে এই সমস্ত ছাত্রদেরকে নিজ নিজ এলাকার ভিত্তিতে অবস্থান নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়।

এই ৪টি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ ছিলঃ

- ক) পূর্ব অঞ্চল জনাব শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব আ স ম আবদুর রব
- খ) উত্তর অঞ্চল জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব মনিরুল ইসলাম
- গ) পশ্চিম অঞ্চল জনাব আবদুর রাজ্জাক ও জনাব সৈয়দ আহমদ
- ঘ) দক্ষিণ অঞ্চল জনাব তোফায়েল আহমদ ও জনাব কাজী আরেফ আহমেদ

প্রশিক্ষণ শিবিরে কর্মরত ছিলেনঃ জনাব নুরে আলম জিকু, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আশ্বিয়া, আফম মাহবুবুল হক ও মাসুদ আহমেদ রুমীসহ অনেকে। বাংলাদেশ কমুনিষ্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ছাত্র সংগঠন সংগঠিত হয়। এই সশস্ত্র যুব শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন জনাব হারুনুর রশীদ, নুরুল ইসলাম নাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ অনেকে। এ ছাড়াও জনাব কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এলাকা ভিত্তিক গড়ে ওঠা টাংগাইল মুক্তি বাহিনীর নাম উল্লেখযোগ্য।

২১. স্বাধীন বাংলা বেতারঃ

১৯৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী আক্রমণে তা ধ্বংস করা হয়। এর পর কিছু দিন আগরতলাতে এবং তারপর ২৫ মে ১৯৭১ কলকাতা থেকে সম্প্রচার নিয়মিত শুরু করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার বিশাল অবদান রাখে। চরম পত্র, রণাংগন কথিকা, রক্ত স্বাক্ষর, মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ত্ববোধক গান ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল।

২২. গণমাধ্যমঃ

বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র প্রকাশ করা। এই সব সংবাদপত্রে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, নেত্রবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলনের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এদের

मध्ये मुजिबनगर থেকে प्रकाशित जय बांग्ला, बांग्लादेश, बज्जबागी, स्वदेश, रणाञ्जन, स्वाधीन बांग्ला, मुक्तियुद्ध, सोनार बांग्ला, विप्लवी बांग्लादेश, जन्मभूमि, बांग्लारबागी, नतून बांग्ला इत्यादि उल्लेखयोग्य। एहाडा मार्किन युक्तराज्ये থেকে प्रकाशित बांग्लादेश निडुज लेटार, बांग्लादेश संवाद परिक्रमा, आमेरिका থেকে प्रकाशित बांग्लादेश निडुज लेटार, बांग्लादेश निडुज बुलेटिन, शिक्षा उल्लेखयोग्य। कानाडा থেকে बांग्लादेश स्फुलिञ्ज नामक संवादपत्र प्रकाशित हत।

### २३. पाकिस्तानी दखलदार बाहिनी ओ तार सहयोगीराः

बांग्लादेशे अवस्थित पाकिस्तान सेनाबाहिनी एकटि दखलदार बाहिनीर भूमिकाय अवतीर्ण हय। देशके शत्रुमुक्ते करार लक्ष्ये बांग्लादेश सरकार एक सशस्त्र युद्धे जडिये पड़े। समग्र जातिके एकत्रित करे विदेशी बक्कु ओ सहयोगी राष्ट्रैर प्रत्यक्ष ओ परोक्ष सहयोगिताय १६ डिसेम्बर '९१ बांग्लादेश शत्रुमुक्ते हय। बांग्लादेशके शत्रुमुक्ते करार एहि सशस्त्र अध्याये उल्लेखयोग्य किछु राजनीतिविद, बुद्धिजीवी, सामरिक बेसामरिक कर्मकर्ता, छात्र ओ युव संगठनेर नेतृवन्द पाकिस्तान दखलदार बाहिनीर सहयोगी हये मुक्तिकामी मानुषेर उपर जघन्य एवं पैशाचिक अत्याचार ओ हत्याकाण्ड चालाय। एहि निर्मम ओ निष्ठुर अत्याचारे शहीद हय ३० लक्ष निरीह निरापराध शिशु-किशोरसह सर्वसुरेर मानुष। शारीरिकभावे लाञ्छित हय २ लक्ष ५० हाजारेर अधिक बांग्लार नारी। देश छाड़ते बाध्य हय प्राय एक कोटि मानुष। सकलेर एकटि मात्र अपराध "तारा छिल बाङ्गालि"। पाकिस्तानेर सामरिक शासकेर दान्तिक उक्ति "आमि मानुष चाइना-पूर्व बांग्लार माटि चाइ"। एहि पोड़ा माटिर नीतिके समर्थन दिये विभिन्न व्यक्ति वा संगठन एगिये आसे।

### २४. शान्ति कमिटीः

४ठा एप्रिल '९१ जनाव नुर्रुल आमिनेर नेतृत्वे अध्यापक गोलाम आयम ओ खजा खयेरउद्दीन टिक्का खानेर साथे साक्षात् करे सर्वप्रकार राजनैतिक सहयोगितार आश्वास प्रदान करेन एवं "नागरिक कमिटी" गठनेर प्रस्ताव पेश करेन। ६इ एप्रिल '९१ अध्यापक गोलाम आयम ओ हामिदुल हक चौधुरी टिक्का खानेर साथे साक्षात् करे "नागरिक शान्ति कमिटी" गठनेर प्रस्ताव देन। ९इ एप्रिल '९१ टाकाय १४० सदस्य निये "नागरिक शान्ति कमिटी" गठित हय। १९इ एप्रिल '९१ एहि कमिटीर नाम परिवर्तन करे "शान्ति कमिटी" राखा हय एवं जेला ओ महकुमा पर्याये एहि कमिटी गठित हय। राजाकार निर्वाचन, नियोग ओ नियन्त्रण एहि कमिटीर अन्यतम दायित्व छिल।

### २५. राजाकार बाहिनीः

मे '९१ मगलाना ए के एम इडसुफेर नेतृत्वे ९६ जन जामायत कर्मी निये खुलनार आनसार क्याम्पे एहि बाहिनी गठित हय। तनि एहि बाहिनीर नामकरण करेन "राजाकार बाहिनी"। एहि बाहिनीर मोट सदस्य संख्या छिल ५०,००० (पञ्चाश) हाजार। पाकिस्तान सेनाबाहिनीर प्रधान सहयोगी हिसाबे एहि बाहिनी दायित्व पालन करे। विशेष करे ग्राम अक्षले एहि बाहिनीर अत्याचारेर चिह्न आजो विद्यमान।

### २६. आलबदर बाहिनीः

১৯৭১ এর আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। এই বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

## ২৭. শরণার্থীঃ

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬, আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

## ২৭. বিজয়ের পরিকল্পনা- সম্মিলিত চূড়ান্ত আক্রমণঃ

অক্টোবর '৭১ মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সমস্ত সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দিয়ে সেনানিবাস অথবা বড় বড় শহর ভিত্তিক অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা মুক্ত করেছিল। নভেম্বর '৭১ এর প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত বাহিনী। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধ এলাকাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে এই যৌথ কমান্ডের নেতৃত্বে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সমন্বিত করে যুদ্ধ পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়। ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান অতর্কিতভাবে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হয়। ৬ই ডিসেম্বর '৭১ ভারত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে সমন্বিত এক যুদ্ধ পরিকল্পনায় সম্মিলিত বাহিনী প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

এই চূড়ান্ত যুদ্ধে ভারতীয় ইষ্টার্ণ কমান্ড অংশ গ্রহণ করে। তাদের সদর দপ্তর ছিল কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে এবং অধিনায়ক ছিলেন লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের তিনটি কোর (৭ টি ডিভিশন), একটি কমুইনিকেশন জোন, একটি প্যারা বিগ্রেড, ৩টি বিগ্রেড গ্রুপ, ১২টি মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ৪৮ টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ১টি আরমার্ড রেজিমেন্ট, ২টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরমার্ড বিগ্রেড, ৩টি ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড, ২৯ টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ান অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের শহীদদের সংখ্যা ৬৯ জন অফিসার, ৬০ জন জেসিও ও ১২৯০ জন সৈনিক। আহত হন ২১১ জন অফিসার, ১৬০ জন জেসিও, ১১ জন এনসিও এবং ৩৬৭৬ সৈনিক। এছাড়াও যুদ্ধে মিসিং হন ৩ জন জেসিও ও ৫৩ জন সৈনিক।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ কে নিয়াজী। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এই অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক জনাব কাদের সিদ্দিকী। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। প্রতি বছর এই দিনটি "বিজয় দিবস" হিসাবে পালিত হয়।

## বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - ১৯৭১ যুদ্ধকৌশল ও সামরিক শক্তির বিন্যাস

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাময় অথচ সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এমন এক নারকীয় গণহত্যা এবং অকল্পনীয় নৃশংসতা চালিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যা পৃথিবীর আর কোথায়ও ঘটেনি।

এই গণহত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল গোটা বাঙালি জাতি। দখলদারদের বিরুদ্ধে তারা অগণিত চোরাগুপ্তা হামলা পরিচালনা করেছিল যা হানাদার পাকিস্তানীদের দিশেহারা করে তোলে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বসলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী ক্ষিপ্ততার সঙ্গে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তান সৈন্যদের উপর। বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ আর গেরিলা যোদ্ধাদের সহায়তায় যৌথবাহিনী মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করে। ফলে বিশ্বমানচিত্রে অভূদয় ঘটে একটা নতুন রাষ্ট্রের, যার নাম বাংলাদেশ। নয় মাসের যুদ্ধে প্রায় তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল - দেশান্তরী হয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো আরও এককোটি বাঙালি। পাকিস্তানীদের পৈশাচিকতার শিকার হয়েছিল লক্ষ কোটি নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশু।

এমন একটা অবিশ্বাস্য গণহত্যা ও নির্যাতন - যা প্রায় প্রতিটি বাঙালি ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, প্রভাব ফেলেছে প্রতিবেশী দেশ ভারত ছাড়াও বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষের মনে-তেমন ব্যাপক যুদ্ধে অসংখ্য ঘটনা ঘটবে স্বাভাবিক ভাবেই। শৌর্য, বীর্য ও অসাধারণ বীরত্ব গাঁথার বহু কাহিনীর সৃষ্টি হবে। তবে এটা দুঃখজনক যে এসব ঘটনার অনেকগুলোই সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। কিছু ঘটনা অনেক বিকৃত হয়েছে। যেহেতু যুদ্ধের শুরুতে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা সংগঠনের অস্তিত্ব ছিলো না এবং পরবর্তীকালে নেতৃত্ব সংগঠিত হলেও যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে যাচ্ছিলো অনিয়ন্ত্রিত ভাবে, তাই বহু ঘটনার সঠিক লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে যুদ্ধের কিছু কিছু বিষয়ে নানা ধরনের অসঙ্গতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। অনেকগুলো ঘটনার ব্যাপারে প্রচলিত কিছু কাহিনী সত্য বিবর্জিত। এবং সেই অসঙ্গতি দূর করার কোনো পদক্ষেপও নেয়া হয়নি। ফলে সত্যকে প্রতিষ্ঠার কাজ এখনও সফল হয়নি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ, বিশেষতঃ সামরিক ইতিহাসবিদগণ যাচাই বাছাই করে বিদ্যমান অসত্যের জাল ছিনড়ব করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরবেন- এটাই সময়ের দাবী। মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকজন সমরনায়ক এবং সংগঠক ও রাজনীতিবিদ এখনও জীবিত থাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার সুযোগ এখনও রয়েছে। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে গোটা দেশকে সেক্টর ভিত্তিক বিভাজন, মুক্তিবাহিনী প্রধান সহ বিভিন্নভাবে সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ এবং যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো বিভিন্ন বাঙালি সেনাকর্মকর্তার অসংগঠিত স্বল্পপরিকল্পিত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এইসব বাঙালি সামরিক অফিসারগণ তাঁদের অধিনস্ত বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সমন্বয় ছাড়াই। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার পরেই গোটা যুদ্ধটা

সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ আসে। এ উদ্দেশ্যে সেসময় বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধরত সামরিক কমান্ডারদের সম্মেলন আহ্বান করা হয় কলকাতায় ৮ থিয়েটার রোডের (বর্তমানে শেখপিয়র সরণী) এক বাড়িতে। বাড়ীটি ছিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এর একটি অফিস, যা যুদ্ধকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। সম্মেলন চলে একাত্তরের ১১ থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে শুরু হয়ে আলোচনা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। যুদ্ধকালীন সশস্ত্র বাহিনী সমূহের প্রধান কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী সম্মেলনের প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বিভিন্নভাবে অধিবেশনগুলিতে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন -

- ১। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ।
- ২। কর্ণেল (অবঃ) (পরবর্তীকালে, জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানী।
- ৩। লেঃ কর্ণেল (পরবর্তীকালে, মেজর জেনারেল) এম. এ. রব।
- ৪। গুপ ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে, এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খন্দকার।
- ৫। মেজর (পরবর্তীকালে, লেঃ কর্ণেল) কাজী নুরুজ্জামান।
- ৬। মেজর (পরবর্তীকালে, মেজর জেনারেল) সি. আর. দত্ত।
- ৭। মেজর (পরবর্তীকালে, মেজর জেনারেল) কে. এম. শফিউল্লাহ।
- ৮। মেজর (পরবর্তীকালে, লেঃ জেনারেল) জিয়াউর রহমান।
- ৯। মেজর (পরবর্তীকালে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) খালেদ মোশাররফ।
- ১০। মেজর (পরবর্তীকালে, লেঃ জেনারেল) মীর শওকত আলী।
- ১১। উইং কমান্ডার (পরবর্তীকালে, এয়ার ভাইস মার্শাল) এম. কে. বাশার।
- ১২। মেজর (পরবর্তীকালে, লেঃ কর্ণেল) আবু ওসমান চৌধুরী।
- ১৩। মেজর এ. আর. চৌধুরী।
- ১৪। ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে মেজর) রফিকুল ইসলাম।
- ১৫। ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে, মেজর) এম. এ. জলিল।

সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্নভাবে দিক, যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাাদি ও ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে লেঃ কর্ণেল এম. এ. রবকে চীফ অফ স্টাফ এবং গুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ পদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয়।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেগুলো হচ্ছে -

- ১। সেক্টরে সমূহের সীমানা নির্ধারণ।
- ২। গেরিলা যোদ্ধাদের সংগঠিত করা।
- ৩। 'নিয়মিত বাহিনী' সংগঠিত করা।

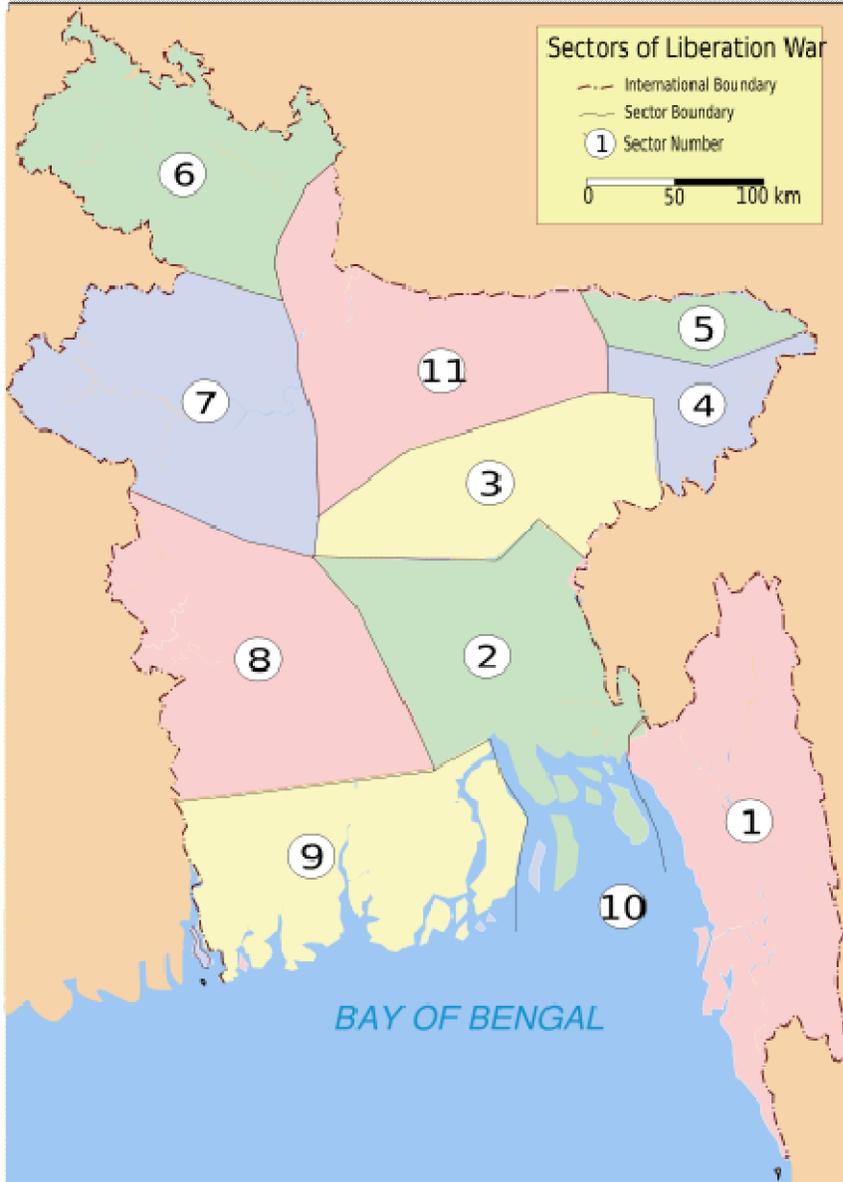
পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদি স্ট্র্যাটেজি হিসাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয় -

- ক) সর্বত্র দখলদার বাহিনীর উপর ক্ষিপ্ত আক্রমণ ও চোরাগোপ্তা হামলার জন্য স্বল্পমাত্রার প্রশিক্ষণ দিয়ে বিপুল সংখ্যক গেরিলা যোদ্ধাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো।
- খ) কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্যে বিদ্যুতের খুঁটি ও স্টেশনগুলি উড়িয়ে দেয়া।
- গ) পূর্বাঞ্চল থেকে কোনপ্রকার কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য পাকিস্তানীদের রপ্তানি করতে না দেয়া এবং তা করা হবে বন্দরের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বন্দরের মালগুদামগুলি ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে।
- ঘ) পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচলে ব্যবহৃত সকল প্রকার যানবাহন, রেল এবং নৌযান সহ সেনা রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্রমাগত আক্রমণ ও ধ্বংস করে দেয়া।

ঙ)

উপর

) হয়।



১

১

১

ক)

)।

খ)

৩০০

৫। গ)

১০০ ও

২,১০০

১,৫০০

, ২০০

।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ২০,০০০। যার মধ্যে ৮,০০০ জনকে সংগঠিত করা হয়েছিলো বিভিন্নডব দলে। ৩৫ শতাংশ গেরিলা এবং সেক্টরবাহিনীর সবাইকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে, মেজর) রফিকুল ইসলাম।

২ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ ফরিদপুরের পূর্ব অঞ্চল, ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল ও ঢাকা শহর, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল লাইনের পূর্ব অংশ ব্যতিত) এবং নোয়াখালী জেলা (মুহুরী নদীর পূর্ব অঞ্চল ব্যতিত)।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৬।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ৪,০০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ৩০,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) খালেদ মোশাররফ।

৩ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ কুমিল্লা জেলার কিছু অংশ (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল লাইনের উত্তর অংশে), সিলেট জেলার কিছু অংশ (চুরামনিকটিলাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ অক্ষের দক্ষিণ অংশ), ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিশন ও ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চল।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ১০। গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ প্রায় ২,৫০০। ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ২৫,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে, মেজর জেনারেল) কে. এম. শফিউল্লাহ।

৪ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ সিলেট জেলার নিম্নোক্ত অঞ্চল সমূহ -

১. পশ্চিম সীমান্তঃ তামাবিল-আজমিরিগঞ্জ-লাখাই অক্ষ।

২. দক্ষিণ সীমান্তঃ লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ অক্ষ।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৬।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ২,০০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ৮,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে, মেজর জেনারেল) সি. আর. দত্ত।

৫ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ তামাবিল-আজমিরিগঞ্জ অক্ষ বরাবর সিলেট জেলার পশ্চিমের বাকি অংশ।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৬।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ৮০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ৭,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল) মীর শওকত আলী।

৬ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ যমুনার পশ্চিমে রংপুর ও দিনাজপুর জেলা, রাণীশঙ্কাইল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ লাইনের উত্তরাংশ ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ-পলাশবাড়ী লাইনের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়েছিল। দিনাজপুরের রাণীশঙ্কাইল, পীরগঞ্জ, বীরগঞ্জ ও রংপুরের পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী ৭ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৫।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ১,২০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ৬,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ উইং কমান্ডার (পরবর্তীকালে, এয়ার ভাইস মার্শাল) এম. কে. বাশার।

৭ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ সমগ্র রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা, দিনাজপুর ও রংপুরের অংশবিশেষ (দিনাজপুরের রাণীশঙ্কাইল-পীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ ও রংপুরের পলাশবাড়ী-পীরগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৮।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ২,০০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ১০,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে লেঃ কর্ণেল) কিউ. এন. জামান।

৮ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ কুষ্টিয়া ও যশোরের সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা। সীমানাঃ উত্তরে পদ্মা নদী। পদ্মা-যমুনার মোহনা থেকে মাদারীপুর পর্যন্ত এর পূর্ব সীমান্ত এবং মাদারীপুর-সাতক্ষীরা কাল্লনিক লাইন ছিলো দক্ষিণ সীমান্ত। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর ৯ নং সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৭।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ২,০০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ৭,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) এম. এ. মঞ্জুর।

(মেজর এম. এ. মঞ্জুর দায়িত্ব বুঝে নেয়ার আগে মেজর (পরবর্তীকালে, লেঃ কর্ণেল) এম. এ. ওসমান চৌধুরী এই সেক্টরে অভিযান পরিচালনা করেন।

৯ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ এবং গোপালগঞ্জ।

খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৮।

গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ ৭০০।

ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ১০,০০০।

ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে, মেজর ) এম. এ. জলিল।

১০ নং সেক্টরঃ

এই সেক্টরের জন্য কোন এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়নি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনীর কমান্ডোদের সমন্বয়ে এই সেক্টর তৈরি করা হয়েছিলো যাতে করে স্বাধীন এলাকাগুলোকে রক্ষা করা যায় এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সকল এলাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্য-ম চালিয়ে নিতে পারে। নৌ বাহিনী কমান্ডোদের বিভিন্নড়ব সেক্টরে পাঠানো হতো পাকিস্তানী নৌযান ধ্বংস ও বন্দর এলাকাগুলোয় আক্রমণ চালানোর জন্য। অভিযান পরিচালনার সময় কমান্ডোরা ওই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করতেন। মিশন শেষে তারা ফিরে এসে ১০ নং সেক্টরের সদস্য হিসাবে অবস্থান করতেন।

১১ নং সেক্টরঃ

ক) এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। উত্তরে যমুনা নদীর তীরে বাহাদুরাবাদ ঘাট ও ফুলছড়িঘাট এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

- খ) সাব-সেক্টরের সংখ্যাঃ ৮।  
গ) সেক্টরবাহিনী সদস্য সংখ্যাঃ এক ব্যাটালিয়ন।  
ঘ) গেরিলা সংখ্যাঃ ২০,০০০।  
ঙ) সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর (পরবর্তীকালে লেঃ কর্ণেল) এ. তাহের।

পরবর্তীকালে তিনটি রেগুলার আর্মি ব্রিগেড গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রত্যেক ব্রিগেডকেই 'ফোর্স' নামে অভিহিত করা হয়। এগুলো হলো, মেজর জিয়াউর রহমানের তত্ত্বাবধানে 'জেড' ফোর্স, মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ'র তত্ত্বাবধানে 'এস' ফোর্স এবং মেজর খালেদ মোশারফের তত্ত্বাবধানে 'কে' ফোর্স। 'কে' ফোর্স গঠন করা হয় ২ নং সেক্টরে। মেজর খালেদ মোশারফ সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালনের সাথে এই ফোর্সেরও নেতৃত্ব দেন।

'এস' ফোর্স গঠন করা হয় ৩ নং সেক্টরে। মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালনের সাথে এই ফোর্সেরও নেতৃত্ব দেন। 'জেড' ফোর্স মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সিলেট ও ময়মনসিংহের জেলার উত্তরে ভারত সীমান্ত এলাকায় এই ফোর্স গঠন করা হয়। মেজর জিয়াকে কোন সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তিনি শুধুমাত্র 'জেড'ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন। অন্যদিকে, মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (৩ নং সেক্টর এবং 'এস' ফোর্স) এবং মেজর খালেদ মোশারফ (২ নং সেক্টর এবং 'কে' ফোর্স) ছিলেন একইসাথে সেক্টর ও ফোর্স কমান্ডার।

সেক্টর সমূহের সীমানা নির্ধারণ ও কমান্ডার নিয়োগের পর সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে একটি নতুন নিয়মিত যোদ্ধা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসামরিক জনগণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 'আক্রমণ কর, সরে পড়'- এই কৌশল অবলম্বন করে গেরিলারা সারাদেশব্যাপী পাকিস্তানীদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকবে। প্রতিদিন এমনি অসংখ্য ছোট-বড় আক্রমণে পাকিস্তানীদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলবে, তাদের লোকক্ষয় হতে থাকবে অব্যাহতভাবে এবং ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে তাদের মনোবল। এমনি করে আঘাতের পর আঘাতে পর্য্যদুস্ত ও মনোবল ভেঙ্গে পড়া পাকিস্তানী সৈন্যদের উপরে সঠিক সময়ে বিদ্যুৎগতির ক্ষিপ্র ও তীব্র, স্বল্প মেয়াদি আক্রমণ পরিচালনা করলে যুদ্ধের মাঠে তাদের পরাজয় অনিবার্য - এটাই ছিলো চূড়ান্ত রণকৌশল। পনের জুলাই সন্ধ্যায় সেক্টর কমান্ডার ও ফোর্স কমান্ডারগণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে অবশ্য কোন প্রকার মত বিনিময় বা সেক্টর সমূহের পরিস্থিতি নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। এটি ছিলো কেবলই শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতামাত্র। সেক্টর এবং ফোর্স কমান্ডারগণ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারে প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। সেক্টর কমান্ডার এবং তিনটি ফোর্সের কমান্ডারগণ নিয়োগ লাভ করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে। সাব-সেক্টর কমান্ডারগণের নিয়োগ বাংলাদেশ সরকার কিংবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে দেয়া হয়নি। তারা নিয়োগ লাভ করেছিলেন স্ব-স্ব সেক্টর কমান্ডারগণের কাছ থেকে।

সেক্টর কমান্ডার এবং তিনটি ফোর্সের কমান্ডারগণ নিয়োগ লাভ করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে। সাব-সেক্টর কমান্ডারগণের নিয়োগ বাংলাদেশ সরকার কিংবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে দেয়া হয়নি। তারা নিয়োগ লাভ করেছিলেন স্ব-স্ব সেক্টর কমান্ডারগণের কাছ থেকে।

স্বাক্ষর - দাতাগণঃ- ( আগস্ট-২০০৮ ইং)

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকার, বীর উত্তমঃ ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ ফোর্সেস।  
মেজর জেনারেল (অবঃ) কে. এম. শফিউল্লাহ, বীর উত্তমঃ ৩ নং সেক্টর ও 'এস' ফোর্সের কমান্ডার।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সি. আর. দত্ত, বীর উত্তমঃ ৪ নং সেক্টর কমান্ডার।  
লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী, বীর উত্তমঃ ৫ নং সেক্টর কমান্ডার।  
লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কি. এন. জামানঃ ৭ নং সেক্টর কমান্ডার (মেজর নাজমুলের মৃত্যুর পর)।  
মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তমঃ ১ নং সেক্টর কমান্ডার।  
নিম্নোক্ত ফোর্স ও সেক্টর কমান্ডারগণ আগেই মৃত্যুবরণ করেছেনঃ

লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তমঃ 'জেড' ফোর্স কমান্ডার।  
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তমঃ ২ নং সেক্টর ও 'কে' ফোর্সের কমান্ডার।  
এয়ার ভাইস মার্শাল এম. কে. বাশার, বীর উত্তমঃ ৬ নং সেক্টর কমান্ডার।  
মেজর জেনারেল এম. এ. মঞ্জুর, বীর উত্তমঃ ৮ নং সেক্টর কমান্ডার।  
মেজর এম. এ. জলিলঃ ৯ নং সেক্টর কমান্ডার।  
কর্ণেল (অবঃ) এ. তাহের, বীর উত্তমঃ ১১ নং সেক্টর কমান্ডার।